## বাংলা কাব্য-কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) যখন বাংলা সাহিত্যে আসেন, তখন বাংলা কবিতা ছিল প্রধানত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সামাজিক ব্যঙ্গ, বিহারীলাল চক্রবর্তীর মন্ময়তা ও প্রকৃতিপ্রেম এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তের মহাকাব্যের ধারা দ্বারা প্রভাবিত। এই তিন ধারা ভিন্ন ভিন্ন দিকে বাংলা কাব্যকে এগিয়ে নিয়ে গেলেও কোনোটিই পুরোপুরিভাবে বাঙালির অন্তরের সুগভীর অনুভূতির প্রকাশ করতে পারেনি। এই শূন্যতা পূরণ করতে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ নতুন এক কাব্যভাষা ও দর্শনের জন্ম দেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কাব্যধারার সমন্বয় ঘটিয়ে বাংলা কবিতাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যান, যা কেবল দেশীয় ধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং তা হয়ে উঠেছিল বিশ্বজনীন।

**রচিত গ্রন্থসমূহ**

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা বিপুল। তাঁর কাব্যজীবনকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা যায়। উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলো হল,

- সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২)
- প্রভাতসঙ্গীত (১৮৮৩)
- কড়ি ও কোমল (১৮৮৬)
- মানসী (১৮৯০)
- সোনার তরী (১৮৯৪)
- চিত্রা (১৮৯৬)
- নৈবেদ্য (১৯০১)
- খেয়া (১৯০৬)
- গীতাঞ্জলি (১৯১০)
- বলাকা (১৯১৬)
- পূরবী (১৯২৫)
- মহুয়া (১৯২৯)
- পুনশ্চ (১৯৩২)
- শেষ লেখা (১৯৪১)

**রচিত গ্রন্থসমূহের আলোচনা**

**প্রারম্ভিক পর্ব (সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত):**

এই পর্বের কাব্যে কবি অন্তর্মুখী হয়ে আত্মগত অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। 'প্রভাতসঙ্গীত' কাব্যেই তিনি বিখ্যাত 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাটি লেখেন, যা তার কাব্যে প্রকৃতির প্রতি এক গভীর মুগ্ধতার প্রকাশ।

**রোমান্টিক পর্ব (মানসী, সোনার তরী, চিত্রা)**

এই পর্বের কাব্যগুলোতে রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক ভাবনার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। 'মানসী' কাব্যে তিনি প্রেম ও সৌন্দর্যের এক নতুন ভাষা তৈরি করেন। 'সোনার তরী'-তে জীবন, মরণ এবং ক্ষণস্থায়ীতার মতো গভীর দার্শনিক প্রশ্নগুলো প্রতীকী রূপকে তুলে ধরা হয়।

**আধ্যাত্মিক পর্ব (নৈবেদ্য, খেয়া, গীতাঞ্জলি)**

এই পর্বের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক চেতনার গভীর প্রকাশ দেখা যায়। 'গীতাঞ্জলি' কাব্যে ঈশ্বরপ্রেম, প্রকৃতিপ্রেম এবং মানবপ্রেম একাকার হয়ে গেছে। এই কাব্যটির ইংরেজি অনুবাদ 'Gitanjali: Song Offerings'-এর জন্য তিনি ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

**গতিময় পর্ব (বলাকা, পূরবী)**

এই পর্বের কাব্যে তিনি জীবনের গতিময়তা, সময় এবং পরিবর্তনের দর্শনকে তুলে ধরেন। 'বলাকা' কাব্যে কবির গতিচেতনা এক নতুন মাত্রা লাভ করে। এখানে সবকিছুই প্রবাহমান ও চলমান।

**শেষ পর্ব (পুনশ্চ, শেষ লেখা)**

এই পর্বের কাব্যে তিনি গদ্যছন্দ ব্যবহার করেন। এখানে কবির দর্শন আরও গভীর এবং জটিল। এই সময়ের কবিতায় তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে মানব জীবনের রহস্য, মৃত্যুচেতনা এবং একাকিত্বকে তুলে ধরেছেন।

**অবদান**

**গীতিকবিতার পূর্ণতা**

বিহারীলাল চক্রবর্তীর হাতে বাংলা গীতিকবিতার যে সূত্রপাত হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তাকে পূর্ণতা দেন। তিনি মানুষের অন্তরকে, তার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোকে কবিতায় তুলে ধরেন,

*"আমার এ গান, তোমারি সুধারে,*
*তোমারি প্রেমে যে জাগে।"*

এই পঙ্‌ক্তিটিতে কবির আত্মগত অনুভূতির প্রকাশ এবং পরমাত্মার প্রতি তাঁর গভীর প্রেম ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যা তাঁর গীতিকবিতার মূল বৈশিষ্ট্য।

**প্রকৃতি ও মানবজীবনের মেলবন্ধন**

তিনি তাঁর কাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে মানবজীবনের এক অভিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁর কাছে প্রকৃতি কেবল দৃশ্য নয়, বরং মানবমনেরই প্রতিচ্ছবি,

*"আজি হতে শত বর্ষ পরে,*
*কে তুমি পড়িছ বসি আমার কবিতাখানি।"*

এই পঙ্‌ক্তিটিতে কবি সময়ের গণ্ডি অতিক্রম করে ভবিষ্যতের পাঠকের সঙ্গে এক আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছেন। এটি তাঁর প্রকৃতি ও মানবজীবনের আন্তঃসম্পর্কের দর্শনের একটি অংশ।

**নতুন ছন্দ ও ভাষার প্রয়োগ**

তিনি প্রচলিত ছন্দের বাইরে এসে নতুন ছন্দ ও ভাষার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। গদ্যছন্দের ব্যবহার এবং শব্দচয়ন ও ব্যবহারের নতুনত্বের মাধ্যমে তিনি বাংলা কবিতাকে এক নতুন রূপ দেন, "*যেতে নাহি দিব, হায়, তবু যেতে দিতে হয়।*" এই পঙ্‌ক্তিটি জীবনের ক্ষণস্থায়ীতাকে সহজ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় তুলে ধরেছে। এটি তাঁর সাবলীল ও দার্শনিক ভাষার এক সুন্দর উদাহরণ।

**আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চেতনার প্রকাশ**

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রেম, প্রকৃতি এবং সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত এক গভীর আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চেতনার জন্ম দেয়। তাঁর কবিতাগুলো পাঠকের মনে এক ধরনের প্রশান্তি ও গভীরতা তৈরি করে,

*"সীমার মাঝে অসীম, তুমি*
*বাজাও আপন সুর।"*

এটি তাঁর দর্শনের মূল কথা। এই পঙ্‌ক্তিটিতে কবি সীমারূপী মানব জীবনের মধ্যে অসীম সত্তার উপস্থিতি অনুভব করেছেন, যা তাঁর আধ্যাত্মিকতার পরিচায়ক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা কবিতা এবং বাঙালির মনন উভয়কেই সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর প্রভাব আজও বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যমান।